সেবাযোগ

স্বামী সুহিতানন্দ

পরমপূজনীয় সহসঙ্ঘাধ্যক্ষ,
রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন

সেবাযোগ কোনও নূতন তত্ত্ব নয়। ঘরে ঘরে আমরা এই সেবার ভাব দেখি। মা ছেলের জন্য, ছেলে মা-বাপের জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য স্বার্থত্যাগ করছে। কিন্তু এই স্বার্থত্যাগ শুধু সীমিত গণ্ডির মধ্যে। আমি ও আমার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে এই সম্পর্কের কোনও অবদান নেই।

একটি আট বছরের মেয়ে তাঁর পাঁচ বছরের ভাইকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। ভাইটি একটু পুষ্ট তাই দিদির পক্ষে বেশ ভার হয়েছে। একজন তার অবস্থা দেখে বলল, ''তোমার ভাইকে দাও আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'' দিদি বলল, ''ও ভার হতে যাবে কেন? ও তো আমার ভাই!'' অর্থাৎ যদি কাউকে আমার নিজের মনে করতে পারি তাহলে বড় বোঝাও হালকা মনে হয়।

আমরা দেখেছি মা ছেলের পছন্দমতো খাবার তৈরি করার জন্য কীরকম পরিশ্রম করেন। এটি পরিশ্রম নয়—এটি আনন্দের, তৃপ্তির প্রকাশ মাত্র। আমরা দেখেছি স্বামীজী বারবার তপস্যা করার জন্য হিমালয় পাড়ি দিতে চেয়ে—বারবার গুরুভাইদের অসুস্থতার সংবাদে ফিরে আসছেন। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখলেন—সাধু হয়েছি বলে কি হৃদয়টা বিসর্জন দিয়েছি? গীতায় এই অবস্থাকেই বলা হয়েছে—''আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।/ সুখং যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥''

একটা বেজি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, এ যজ্ঞই নয়। কেন না তার গায়ের রং বদলাল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি অতিথিসেবার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন—দুর্ভিক্ষের সময় কষ্টে সংগৃহীত ছাতুর সবটুকুই অতিথিকে দিয়ে নিজেরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তাঁদের বাড়ির মেঝেতে পড়ে থাকা সেই ছাতুর গুঁড়োর ওপর গড়াগড়ি দেওয়ার সময় বেজির শরীরের অর্ধাংশ সোনার হয়েছিল। বাকি অংশ সোনার করার জন্য সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের জন্য না ভেবে অন্যের সেবাই ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণ তখন ভগবান বলে পরিচিত হয়েছেন; তিনি রাজসূয় যজ্ঞে কী কাজের ভার নিলেন?—যেসব অতিথি আসবেন তাঁদের পা ধুইয়ে দেবেন। কতখানি নিরহঙ্কার হলে এই ভাব আসে। স্বামীজী বলেছেন, ''Egolessness is God.''

পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম ত্যাগের, সেবার কথা বিরল নয়। স্যার ফিলিপ সিডনি—কম্যান্ডার ইন চিফ—যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছেন। সৈন্যরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বড় পিপাসা পেয়েছে—বললেন, 'একটু জল'। একজন সৈনিক একটু জল সংগ্রহ করে আনল। তিনি দেখলেন পথে এক মৃতপ্রায় সৈনিক কাতরস্বরে বলছে 'জল জল'। তখনই তিনি সেই জল তাকে দিয়ে বললেন, ''Thy necessity is greater than mine.'' আমরা রন্তিদেবের সেবার কথাও শুনেছি। কিন্তু আর একরকম সেবাধর্মের প্রয়োগ আমরা দেখেছি। বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানগণ জগতের সামনে সেবার এক উচ্চ আদর্শ রেখে গেছেন। এখানে ব্যক্তি প্রধান নয়—institutionalized হয়েছে সেবাযোগ। তাঁরা সেবাকে নির্বাণের বা kingdom of heaven-এর সহায়ক ভেবে নিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মে জীবসেবার পরিধি এতই ব্যাপ্ত হয়েছিল যে স্থানে স্থানে পশু হাসপাতাল পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম বা খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রধান গুরুত্ব না দিয়ে সমাজের সুখসুবিধার উপর মুখ্য গুরুত্ব দেওয়ায় সমাজের খুব উন্নতি হলেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য গৌণ থেকে গেছে। খ্রিস্টধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই তারা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল করেছে—সমাজের যাতে উন্নয়ন হয়। যখন মাদার টেরেসাকে বলা হল—আপনি ধর্মান্তরিতকরণের জন্য সেবা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "Then what for else?" অর্থাৎ সেবাতে সেব্য লক্ষ্য নয়। সেবার মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়, নিজ প্রতিষ্ঠান বা নিজ সমাজের প্রসারই লক্ষ্য। শিখধর্মে করসেবা, সাধুসেবার কথা আছে, ইসলাম ধর্মে দানের প্রচুর প্রশস্তি আছে। কিন্তু এই সেবা ঈশ্বর বা আল্লাকে খুশি করার জন্য। সেব্য জীবের সন্তোষই লক্ষ্য নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ''চোখ বুজলে তিনি আছেন, চোখ চাইলে তিনি নেই?'' ''প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না?'' ''শালগ্রামের থেকেও মানুষ বড়।''

চোর-বজ্জাত মানুষের মধ্যে কীভাবে তাঁর প্রকাশ ঘটে? কীভাবে সেখানে ভগবানকে পাব ও সেবা করব? আসলে মানুষের পাঁচটি কোষ আছে। একটি অন্নময় কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ, মরে গেলে যেটা পড়ে থাকে। প্রাণময় কোষ অর্থাৎ জীবের মধ্যে প্রাণশক্তি যাকে পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়াম দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়। মনোময় অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতি যেখানে হয়। বিজ্ঞানময়—বুদ্ধি—ভালমন্দ, চোর-সাধু বিচার করতে পারে যে। আনন্দময়—যেখানে এগুলির বাইরের সত্তার একটু অনুভব হয়।

প্রেমেশানন্দজী মহারাজকে এক ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করলেন—মানুষের পাপেই তার আধিব্যাধি, সুতরাং সেবা করলে তো পাপীর সেবা হবে! তাতে অসৎ সঙ্গে তো আরও ক্ষতি হবে! সেই ব্রহ্মচারী জানেন না যে যাঁর সেবা করছেন তিনি ভিতরের চৈতন্য, যিনি পাপপুণ্য ভালমন্দ দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। সুতরাং কোনও জীবকে সেবা করতে হলে সেই জীবের পাঁচটি কোষ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা চাই। আবার প্রত্যেক জীব এক-একটি স্বতন্ত্র সত্তা। সুতরাং প্রতি জীবের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই, সেইসঙ্গে এই অভিজ্ঞতাও চাই—কীভাবে কোষগুলির পুষ্টি ও বিকাশ ঘটবে।

এই বিকাশের প্রক্রিয়াকে বলে তার অভ্যুদয়। সেবার আদর্শ হল, প্রতিটি জীবকে বিকাশের জন্য সাহায্য করতে হবে, বিকাশের বাধাগুলি দূর করতে হবে। জীবের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করতে করতে সেই দেহ-মন-বুদ্ধিকে আপনবোধ হয়; তাতে ভালবাসা আসে। এ কিন্তু আসক্তির নামান্তর। ঘরে ঘরে আমরা এইরকম ভালবাসার প্রকাশ দেখি। দেহ-মন-বুদ্ধির পারে যে-চিৎসত্তা তার সেবা সাধারণ মানুষ করে না। যদি কোনও জীব থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়—চিৎসত্তার অভাব

হয়, তখন আর সেবার দরকার হয় না। তখন ডাক্তার, নার্স, মাতা, পিতা, সাধু কেউই মৃতব্যক্তির সেবা করে না।

যদি সেবার সঙ্গে এই জ্ঞান না থাকে, তাহলে সেবাতে আসক্তি বা স্বার্থচিন্তা আসতে বাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের ভিতর নারায়ণকেই দেখতেন, তাই অত ভালবাসতেন। মায়ের কথা থেকেও বোঝা যায়, তিনি সন্তানদের দুভাবে সেবা করতেন—সন্তানভাবে ও নারায়ণভাবে।

স্বামীজীর যে concept—''জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর''—তার অর্থও এই। অর্থাৎ ত্রাণকাজে, হাসপাতালে, স্কুলে, মঠে, শাস্ত্রব্যাখ্যায় আমরা প্রথম সেবা করি মনুষ্যদেহধারী চৈতন্যের; তারপর সেবা করি সেই চৈতন্যকে আশ্রয় করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে-দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি তাঁদের। এই উভয় সত্তারই সেবা করি আমরা।

স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলিতে বলেছেন, ক্ষীণস্রোতা নদী বেগবতী হয়—বিশালতা প্রাপ্ত নদীর বেগ হ্রাস হয় কিন্তু বিস্তার ঘটে। কিন্তু সকল প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আমরা একাধারে বিশালতা, উদারতা এবং গভীরতার প্রকাশ দেখি। কোনও ব্যক্তিজীবনে যদি বিপরীতমুখী গতির সহাবস্থান সম্ভব হয়, তবে কেন ওই ছাঁচে সমাজজীবন গঠন হবে না? কারণ ব্যক্তির সমষ্টিই তো সমাজ!

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আধ্যাত্মিক গভীরতা দেখি—যেকোনও অবস্থায় ঈশ্বর ছাড়া তাঁর কোনও চিন্তার বস্তু ছিল না। এত গভীর ঈশ্বরতন্ময়তা আমরা ইতিহাসে কারও দেখি না। তিনি বলতেন, ''মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না।'' সেইসঙ্গে তিনি যেকোনও ধর্মে, যেকোনও মতে সাধন করেছেন। আবার চোখ চেয়েও যে সেই ভগবানকেই দেখা যায়—এমনকী বিপরীত পরিবেশেও—তারও সার্থক প্রকাশ তাঁর জীবনে। মিউজিয়াম, সার্কাস, থিয়েটার সর্বত্রই যে সেই বিশ্বনাথের প্রকাশ, তাঁর মুহুর্মুহু সমাধি তার প্রমাণ।

তাঁর ব্যক্তিজীবনে যে-তত্ত্বের আবিষ্কার, সেই তত্ত্বের ব্যাবহারিক প্রয়োগের জন্য শ্রীশ্রীমাকে রেখে গেলেন তিনি। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও আমরা গভীরতা, উদারতা এবং বিশালতা দেখে স্তব্ধ হই। ভক্তের জাত নেই, কে শূদ্র? সে তো ছেলে! সে তো ভক্ত! ইংরেজদের সম্পর্কে বলেছেন, ''ওরাও তো আমার ছেলে।'' বেড়াল সম্বন্ধে বলেছেন, ''ওর মধ্যেও তো আমি আছি।'' ঝাঁটাকেও মান দিতে শিখিয়েছেন। আমজাদ ও শরৎ দুজনের একটিই পরিচয়—তাঁরা মায়ের ছেলে। সরলাকে নার্সিং শিখতে পাঠাচ্ছেন এই যুক্তিতে—ওটিও তো একটি বিদ্যা। তাছাড়া সে-বিদ্যা শিখে এসে সে তো তাঁদেরই সেবা করবে।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' শুনে বলেছিলেন, ''ভগবান যদি দিন দেন, তাহলে আজ যা শুনলাম এই সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব।'' জীবই শিব। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও গভীরতা, উদারতা এবং বিশালতা আসবে।

প্রেমেশ মহারাজ একবার হৃষীকেশে একান্তবাস করছিলেন। তখন সেখানে মহাপণ্ডিত চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—তাঁকে বলেন, ''আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ আমি বুঝতে পারছি না।'' তখন প্রেমেশ মহারাজ তাঁকে বললেন, ''আমরা জানি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' একটি মহাবাক্য। 'তত্ত্বমসি'ও একটি মহাবাক্য। যখন আমরা ধ্যানজপ করি তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের সাধন করি আর যখন আমরা জীবের সেবা করি তখন 'তত্ত্বমসি' রূপে ঈশ্বরেরই সেবা করি।'' একথা শুনে রাজেন ঘোষ দুহাত তুলে ধেই ধেই করে নেচে বললেন, ''আমার বহুদিনের এক দ্বন্দ্বের নিরসন হল।''

রিবাকভ—মস্কো ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল

রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর—গোলপার্কে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : স্বামীজীর জীবশিববাদের অর্থ বুঝতে মানব সভ্যতার মনে হয় আরও একশো বছর লাগবে।

আমরা জানি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একাধারে সম্ভব নয়, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স একত্র থাকতে পারে না। যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম। কিন্তু সকল পূর্ব দৃষ্টান্তকে লঙ্ঘন করে জীবশিববাদ প্রমাণ করেছে—উভয় মেরুর সহাবস্থান সম্ভব। শিবজ্ঞানে যখন জীবের সেবা হয়—তখন যিনি সেবক ধীরে ধীরে তাঁর স্বার্থচিন্তা কমে এবং 'আমি'-র ব্যাপকতা হতে থাকে—যতদিন না 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র' ভাব আসছে। সেইসঙ্গে যে-জীবের সেবা করা হয় সেই জীবেরও ধীরে ধীরে আবরণের উন্মোচন হয়। যার দেহের প্রয়োজন বেশি তার অন্নময় কোষের সেবা, যার মনের সেবা অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োজন তার মনোময় কোষের সেবা। যার মধ্যে যে-বস্তুর অভাব সেটি দূর করে তাকে উন্নত করতে হবে—যতদিন না সে আধ্যাত্মিক আনন্দ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়।

এইভাবে দেখা গেল সেবকের নিবৃত্তিমার্গের সাধনা এবং সেব্যর প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা, সেবকের নিঃশ্রেয়স ও সেব্যর অভ্যুদয়—এই উভয় মেরুই জীবশিব সাধনার মাধ্যমে সম্ভব হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ একবার প্রেমেশানন্দজীকে স্বামীজীর সেবা সম্বন্ধে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করতে বলেন। প্রেমেশ মহারাজ সেটির নাম দেন 'সেবাযোগ'। জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ—যেকোনও মাধ্যমেই ভগবানের সঙ্গে সংযোগ সম্ভব হয় কিন্তু সেবাযোগ এমন একটি মাধ্যম যার মধ্যে একইসঙ্গে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ চারটিরই সাধনা সম্ভব। সেবা এমন একটি যোগ যার মাধ্যমে সাধক সবসময় নিজেকে ইষ্টবস্তুতে নিয়োজিত রাখতে পারে। আমি কারও সেবা করছি, আমি জানি আমার এই সেবার মাধ্যমে আমার ইষ্টের সন্তোষ হবে—এই যে বোধ এইটি জ্ঞান, যে-মুহূর্তে ভাবলাম এঁর সেবা দ্বারা আমার ইষ্ট খুশি হবেন তখন ইষ্টকে সুখী করতে তাঁর প্রিয় কর্ম করব। যতই সেবা করব ততই তাঁর প্রতি প্রীতি জন্মাবে—সেটাই ভক্তি। এইসব ভাবেই আমরা indirectly তাঁর সঙ্গে যুক্ত হব।

ঠাকুর-মা-স্বামীজী, পার্ষদ মহারাজগণ এই সেবাযোগের দ্বারা এক বিশাল হোমানল জাগ্রত করেছেন—যার তাপে এই সঙ্ঘ প্রজ্বলিত। অগণিত সাধুভক্ত এর তাপে নিজ নিজ জীবন অমৃতে পরিণত করছেন। সুতরাং জীবশিববাদ বা সেবাযোগ এমন একটি সাধন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে—

১। নিজ পরিবারের মানুষগুলিকেও সেবা করা যায়—যেমন ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, ''তোর ভাইপোকেই গোপাল ভাববি।''

২। নিজ পরিবার অতিক্রম করে প্রতিবেশীদেরও আপন ভাবা যায়। রামকৃষ্ণভক্ত এবং সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এর বহু নিদর্শন দেখা যায়।

৩। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সহযোগে একটি নতুন সমাজব্যবস্থার কথাও ভাবা যায়, যা পূর্ব পূর্ব যুগে কখনও পরীক্ষিত হয়নি। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে স্বামীজীর সেবাযোগের পার্থক্য এখানেই। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই বিকাশ হয় এই সেবাযোগের মাধ্যমে।

লাটু রামচন্দ্র দত্তের বালকভৃত্য। দক্ষিণেশ্বরে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবার জন্য। একদিন পঞ্চবটীতে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন তার জুতো পঞ্চবটীতে পড়ে রয়েছে। তিনি নিজহাতে তুলে রাখলেন, পাছে পরে লাটুর অসুবিধা হয়। বাড়িতে সাধারণত মা-ই এইভাবে নিজ সন্তানের সেবা করেন। কাশীপুরে শীতকালে ঠাকুর চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় শুয়ে আছেন। দেখা গেল সেই অবস্থায়ও নিজের দেহটিকে মাটিতে টেনে টেনে আলনার কাছে গিয়ে আলনা থেকে একটি চাদর টেনে নামাচ্ছেন। সেবক শশী মহারাজ ভাবলেন ঠাকুরের

দরকার, শীত করছে। না, ঠাকুর দেখেছেন শশী শীতে কাঁপছে, তার গা ঢাকবার জন্য চাদরটি কষ্ট করে টেনে তার গায়ে দিচ্ছেন। কাশীপুরে থাকতে গিরিশকে ঠান্ডা জল খাওয়াবেন—নিজে কোনওমতে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে কুঁজো থেকে জল ঢেলে তাঁকে দিচ্ছেন—যখন তাঁর পাশ ফিরে শোবারও শক্তি নেই। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, ''তিনি ছিলেন যেন ঠিক আমাদের মা।''

মা সারাজীবন যেন সকলের দাসীত্ব করতেই এসেছিলেন। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা আরতির পর একটি দৃশ্য দেখি। একটি শিশু—দুবছরের হবে। তার মা তার পায়ে জুতো পরিয়ে দেবে। সে করছে কী—তার মার কোলের উপর পাটা তুলে দিয়েছে আর মাঝে মাঝে পা দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। মা আদরের সঙ্গে শিশু ভগবানের সেবা করে যাচ্ছেন। আমাদের মা ঠাকরুণের জীবন এমন কাহিনিতেই পূর্ণ।

মায়ের তিথিপূজা। তাঁর নামে পূজা ও হোম চলছে। চারিদিকে উৎসবের উন্মাদনা। দলে দলে লোক আসছে; সেবকরা কাঁড়ি কাঁড়ি ফুলের গাদা সরাচ্ছে। হঠাৎ মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় মা! দেখা গেল সিঁড়ির নিচে একটা তোলা উনুনে মা কী রান্না করছেন। বাড়িতে আদেশ পালনের জন্য লোকের অভাব ছিল না। মাকে কেউ অনুযোগ করলে মা বললেন, ''বাবা উৎসবের বাড়ি, সবাই ব্যস্ত; বউটি অসুস্থ—এসব তো তার সহ্য হবে না তাই তার জন্য এই ঝোলটুকু রান্না করে দিলাম।''

পরবর্তী ঘটনা আরও মর্মস্পর্শী। তাঁর এক শিষ্য ভক্তির প্লাবনে তাঁর কাছ থেকে একটু অন্নপ্রসাদ চেয়েছেন, উদ্দেশ্য জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মতো মধ্যে মধ্যে একটু একটু মুখে দেবেন—কারণ তিনি বহুদূরে থাকেন। তাঁর ব্যাকুলতা দেখে মা তাঁকে প্রসাদ দিলেন। ভক্ত ভাবলেন রোদে শুকিয়ে নিয়ে যাবেন। উঠোনে সেটি রাখা হয়েছে, ভক্ত তখনি পাহারা দিতে আসবেন ভেবেও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভাঙতে এসে দেখেন মা প্রসাদের কাছে বসে আছেন। ''মা, তুমি শুতে যাওনি?'' ''কী করে যাব বাবা, তোমার ওটিতে পাছে কাকে মুখ দেয় তাই বসে আছি।'' প্রথমজন তাঁর বৃহৎ পরিবারের একজন; দ্বিতীয়জন সম্পূর্ণ অপরিচিত সন্তান। সেবাযোগের এমন সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া মহা সৌভাগ্যের কথা।

স্বামীজী নিজ শিষ্য গুপ্ত মহারাজের জুতো কাঁধে তুলে নিয়ে চলেছিলেন। বরাহনগর মঠে হাণ্ডা মাজা নিয়ে গুরুভাইদের মধ্যে মনকষাকষি দেখে স্বামীজী —''নিয়ে আয় তোদের কত হাণ্ডা বাসন আছে, আমি মেজে দিচ্ছি''—বলে একটি হাণ্ডার উপর বসে গান গাইতে গাইতে হাণ্ডা মাজতে লাগলেন।

মনে পড়ে মঠে অনেক মানুষ অপেক্ষা করছেন প্রসাদ পাওয়ার জন্য। স্থানাভাব। এক জায়গায় অনেকগুলি জুতো পড়ে আছে—সরিয়ে দিলে অনেকের জায়গা হবে। সবাই বলছে—কার জুতো? কার জুতো? হঠাৎ সঙ্ঘগুরু মহাপুরুষ মহারাজ এসে জুতোগুলি দুহাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সকলে হইহই করে উঠল।

অখণ্ডানন্দ মহারাজ প্রেসিডেন্ট হতে চান না। অনেক বলাতে রাজি হয়েছেন। তাঁকে যখন বেলুড় মঠে থাকতে জোর করা হচ্ছে তখন বললেন, ''আমি গ্রামের গরিবদের ছেড়ে যেতে পারব না। তোমরা বরং প্রেসিডেন্ট বদল করে নাও।''

বাবুরাম মহারাজ দেখলেন, গরমের দুপুরে একটি লোক মঠে ঢুকেছে। বড় ক্লান্ত। তিনি একটি হাতপাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। লোকটি আপত্তি করলেও মহারাজ মায়ের মমতায় তাকে বাতাস করতেই থাকলেন। লোকটি গুপ্তচর। মঠের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছিল।

আমরা সেবাযোগের অনেকগুলি উদাহরণ তুলে ধরেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবানসদৃশ

ব্যক্তিদের পক্ষেই এই সেবাযোগ সম্ভব। যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে সেবাযোগকে একটি সাধনপ্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা হল না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনজগতে আমরা দেখছি এই ধারা প্রবাহ আকারে নিত্য।

বিরজানন্দ মহারাজ অসুস্থ। তাঁকে দেখতে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রাঁচি থেকে ট্রেনে এসেছেন সন্ধ্যাবেলায়। এসেই ঠাকুর প্রণাম করে সোজা বিরজানন্দজীকে দর্শন করতে তাঁর ঘরে গিয়েছেন। একটু কুশল আলাপের পরই বিরজানন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কিছু খেয়েছ?'' বিশুদ্ধানন্দজী বললেন, ''সন্ধ্যাদি করে খাব।'' বিরজানন্দজী বললেন, ''তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের অতশত মানতে হবে না।''

একবার কোথা থেকে প্রেমেশানন্দ মহারাজ এসেছেন। বিরজানন্দজীকে প্রণাম করতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কী খাওয়াবেন! প্রেমেশানন্দজী খাওয়ার পর হাত ধুতে যাবেন, বিরজানন্দজী কিছুতেই উঠতে দিচ্ছেন না—জল আনিয়ে ওখানেই বসিয়ে তাঁর সেবা করলেন। আমরা এইসব ব্যবহারের মধ্যে দেখতে পাই আমাদের মা-ই যেন উঁকি মারছেন।

প্রেমেশানন্দজীর কাছে আসত একটি যুবক। বেশ বৈরাগ্যবান কিন্তু কর্মফলে একটি যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং বিবাহও করে। এই আচরণের জন্য সে অন্যদের চোখে হীন হয়ে গেল এবং নিজেও অপরাধীর মতো থাকত। মহারাজ একদিন তাকে ডেকে আনিয়ে নিজের হাতে নিজের বাটিতে মুড়িতে ঘি ও চিনি মাখিয়ে চামচ সহ তার মুখের কাছে ধরলেন। সে আবেগাপ্লুত হয়ে খেতে লাগল—সব জড়তা কেটে গেল।

একটি যুবক গরমের দুপুরে ট্রেনে এসেছে সারগাছি আশ্রমে। সমস্ত আশ্রম নিস্তব্ধ, রোদে খাঁ খাঁ করছে। যুবকটি চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে। দুটোর সময় প্রেমেশ মহারাজ উঠে তাকে দেখতে পেলেন। একটি বাটি নিয়ে উঠান থেকে এক বাটি জাম—গাছ থেকে মাটিতে পড়েছিল—তুলে ধুয়ে তাতে নুন মাখিয়ে তার মুখের সামনে ধরলেন। এই কি নারায়ণের সেবা?

এক অবিবাহিত যুবক। বিরজানন্দ মহারাজের শিষ্য, জাপক। তখন কলকাতায় খাম, পোস্টকার্ডের খুবই অভাব। সে বেশ কিছু খাম, পোস্টকার্ড কিনে অফিসে এক জায়গায় রেখে দিল এবং লিখে দিল—পয়সার বিনিময়ে নিজেই নিতে পারেন।

একজন জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি সব পয়সা ফেরত পান?

সে হেসে বলল—দূর! পাওয়া যায় নাকি?

—আপনার দুঃখ হয় না?

যুবক উত্তর দিল—আমি তো ধরেই নিই কিছুই পাব না। সুতরাং যা পাই সেটাই আমার লাভ।''

সন্তোষাৎ অনুত্তমঃ সুখলাভঃ।

এই সেবাযোগের দ্বারা মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবতা হয়—অথচ সাধনপ্রক্রিয়া কত সহজ, সরল, সাবলীল। নিবেদিতা বলেছেন, এই নতুন ধর্মে the demarcation between spiritual and secular has been obliterated. রাজা মহারাজও বলেছেন, ঠাকুর এসে দেবলোক ও মনুষ্যলোকের মাঝে একটা সেতু করে দিয়ে গেছেন।

ভগবান বুদ্ধের একটি কাহিনি বলে শেষ করব। বুদ্ধদেব ভাষণ দেবেন, চার হাজার শ্রমণ অধীর আগ্রহে বসে আছেন। কিন্তু বুদ্ধ আসছেন না—খবর এল তিনি জনৈক অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-পরিচর্যা করতে গিয়েছেন। সকলে উসখুস করলেও কারও প্রশ্ন করার সাহস নেই। বহু পরে বুদ্ধ এলেন—সকলে তাঁর বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল। বুদ্ধ বললেন, আমার বিলম্বে আসার কারণই আমার বাণী—সেবা দ্বারা সকলের সঙ্গে একীভূত হওয়া।